সাম্যবাদ বুলেটিন

‘বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)’-এর মুখপত্র

১১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৩ | web: www.spbm.org | মূল্য ২ টাকা

জনগণের প্রতি ‘বাসদ (মার্কসবাদী)’–এর আহবান

একতরফা নির্বাচন বয়কট করুন

তফশীল ঘোষণার পরপরই বামজোটের বিক্ষোভ, ফেনী ও কিশোরগঞ্জে হামলা
তফশীলের প্রতিবাদে বামজোটের হরতালে নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুরে হামলা ও গ্রেফতার

আমরা কোরবানির ঈদের আগে যেমন হাট বসে, এই নভেম্বরে তেমনি হাট বসেছিল ঢাকায়– মনোনয়নের হাট! গুলিস্তানে আওয়ামী লীগ অফিসের চারপাশে জমেছিল দেশসেবকদের ভীড়! বাদ্য বাজিয়ে, নেচে-গেয়ে, ভাড়া করা সমর্থকদের নিয়ে দেশ ও জনগণের তথাকথিত সেবকরা গিয়েছেন মনোনয়ন ফরম কিনতে। প্রথমে তারা কিনবেন মনোনয়ন ফরম, তারপর কিনবেন প্রার্থীর পদ। একটা সময় ছিল যখন নির্বাচনের আগে অন্তত মানুষের কাছে একটু যেতে হতো। ভোট চাইতে হতো। এখন তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কারণ নির্বাচনে জেতার যুগ চলে গেছে, এখন যুগ মনোনয়নে জেতার। গোটা দেশে আজ আর নির্বাচিত কেউ নেই, সবাই মনোনীত। আরেকটা একতরফা নির্বাচন আয়োজন করতে চলেছে আওয়ামী লীগ। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। চলছে বিরোধী খোঁজার কাজ। সাজানো পার্লামেন্টে বিরোধী দলের চেয়ারে বসার জন্য কাঠের পুতুল পাওয়া যাচ্ছে না। জাতীয় পার্টি, তৃণমূল বিএনপি ও বিএনএম–এর মতো পোষ্য দলগুলোকে দিয়ে এই চেষ্টা চলছে। চেষ্টা চলছে বিএনপির নেতাদের লোভ ও ভয়– এই দুইয়ের মাধ্যমে নির্বাচনে নিয়ে আসার। চলছে খোলামেলা কেনাবেচা। ভাষা বদলে গেছে রাজনীতির। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা, রাজনৈতিক দাবি আর বক্তব্যে নেই। কেউ এই নির্বাচনকে বলছেন প্রতিপক্ষ ছাড়া টুর্নামেন্ট, কেউ পাল্টা বলছেন পরিস্কার খেলা– ফাউল কম হবে। এ এক বীভৎস গণতন্ত্রের চেহারা দেখছে মানুষ!

বিরোধীদের উপরে হামলা-নির্যাতন অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে

একতরফা তফসিল ঘোষণা করার পরপরই বামজোট সারাদেশে বিক্ষোভ করে। বিভিন্ন জেলায় সেই বিক্ষোভে হামলা চালায় আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা। ফেনীতে বামজোটের বিক্ষোভ মিছিলে নৃশংস হামলা চালিয়ে বামজোট ও ‘বাসদ (মার্কসবাদী)’ ফেনী জেলার সমন্বয়ক জসিম উদ্দিন, জেলা শাখার সদস্য রাইহানে কুমু, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ফেনী জেলার আহবায়ক নয়ন পাশা, সাধারণ সম্পাদক মোবারক হোসেন জামসেদ, সদস্য শাফায়েত সাগর, নাজনীনসহ ১০/১২ জন নেতাকর্মীকে আহত করে। তারা শুধু নৃশংস হামলাই করেনি, নারী কর্মীদের প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত ও আহত করে। একইদিনে কিশোরগঞ্জের মিছিলে হামলা চালিয়ে আহত করা হয় ‘বাসদ (মার্কসবাদী)’ কিশোরগঞ্জ জেলার সমন্বয়ক আলাল মিয়াসহ ৪/৫ জনকে। হরতালের দিনে নারায়ণগঞ্জে বামজোটের মিছিলে পুলিশ হামলা চালায়। এতে ২০ জন বামজোট নেতাকর্মী আহত হন। রংপুরে বামজোটের মিছিল থেকে গ্রেফতার করা হয় বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল কুদ্দুসকে।

এরমধ্যে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেনী, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলায় বিএনপি নেতাদের বাড়িতে রাতের বেলা হামলা চালানো হয়েছে। ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশের পর থেকে বিএনপির প্রায় ১৬ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নেতাদের না পেয়ে তাদের ভাই, সন্তান এমনকি পিতাকেও তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। থানাগুলোর বাইরে, জেলের গেটে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পরিবার-পরিজনরা ভীড় করছেন প্রতিদিন। এদের খাওয়া নেই, ঘুম নেই। তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও হামলা করা হচ্ছে।

এই ঘটনা এদেশের রাজনীতিতে বিরল। ভিন্ন ভিন্ন দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের পরিবেশ ছিল বাংলাদেশের রাজনীতিতে। খানিকটা রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। সেটা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ। পুলিশকে বাড়ি চিনিয়ে দিয়ে বিরোধীদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করছে তাদেরই প্রতিবেশী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সংগঠকরা। এই সুযোগে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাও চরিতার্থ করছে। ঘর থেকে, দোকান থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে খুন, হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও নাশকতার মামলা দেয়া হচ্ছে।

শুধু রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন নয়, কোনরকম প্রতিবাদই সরকার সহ্য করছেনা। জাতীয় শিক্ষাক্রম নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে সকল মহলেই। অভিভাবকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ‘সম্মিলিত শিক্ষা আন্দোলন’ নামে একটি প্লাটফর্ম গঠন করে প্রতিবাদ করছিলেন। যে ফেসবুক গ্রুপকে কেন্দ্র করে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন, মাত্র দুটি প্রোগ্রামের পরই সেই গ্রুপের এডমিন ও সংগঠকদের মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করা হলো। তারপর রিমান্ডে নেয়া হলো। এখনও পর্যন্ত তারা ছাড়া পাননি।

শুধু বিরোধীদের দমন নয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতিও ধ্বংস করা হয়েছে

আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য এখন নির্বাচনকে প্রতিযোগিতামূলক দেখানো। প্রার্থী কেনা-বেচাও হচ্ছে খোলামেলাভাবে। বিএনপি নেতা তৈমুর আলম খন্দকার তৃণমূল বিএনপি থেকে সাজানো নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় টেলিফোন কলে তার যে কথোপকথন, সেটা থেকে এই নির্বাচন নিয়ে কী ধরনের নোংরা কূটকৌশল চলছে তা বোঝা যায়। বিএনপি নেতা শাহজাহান ওমর আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। জেল থেকে ছাড়াও পেয়েছেন এই দলবদলের জন্য। পরবর্তীতে সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেছেন, ‘তৃণমূল বিএনপি ও বিএনএম রাবিশ পার্টি, এগুলো ফকিন্নি-ননসেন্স পার্টি। ২-৩ কোটি টাকা পেয়েছে, নির্বাচনে দাঁড়িয়ে গেছে।’ তার সেই স্পর্ধা আছে বলেই শেখ হাসিনা তাকে ১ ঘণ্টার ভেতর নমিনেশন দিয়েছেন, আর যাকে আগে দিয়েছিলেন তাকে বাদ দিয়েছেন। তার প্রেসিডেন্ট-প্রাইম মিনিস্টার যে কোন জায়গায় ফ্রি এক্সেস। এই হলো প্রার্থীদের অবস্থা!

নির্বাচনে কৃত্রিম প্রতিযোগিতা সৃষ্টির জন্য দলের মনোনয়নবঞ্চিত আওয়ামী লীগ নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন। এতে পোষ্য দলগুলো থেকে দাঁড়ানো প্রার্থীরা আতঙ্কিত হচ্ছেন। কারণ এখন যারাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন, তারা সকলেই জেতার নিশ্চয়তা চান। মহাজোটের শরিক দলগুলো নৌকা প্রতীক চাইছেন, এমনকি জাতীয় পার্টিও নৌকা প্রতীক চাইছে। ডামি বিরোধীরা আওয়ামী লীগের অন্যান্য প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহার চাইছেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তারা জাতীয় বেঈমান যেহেতু হতে রাজিই হয়েছেন, সিট হারাতে তারা চান না।

বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি রাজনীতির এই হলো আজকের পরিণতি! এর মধ্যে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নেই, কোন নৈতিকতা নেই, ন্যূনতম রাজনৈতিক কর্তব্য নেই। আছে শুধু নগ্ন ব্যক্তিস্বার্থ, জনগণের কল্যাণের নামে নিজেদের বিত্ত-বৈভব বাড়ানো।

‘ডামি’ বিরোধী প্রার্থী সৃষ্টি করে নির্বাচন– রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের প্রকাশ

সাজিয়ে-গুছিয়ে কিছু নামসর্বস্ব রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে ডেকে নিয়ে এসেছে আওয়ামী লীগ। পোষ্য বিরোধী দল জাতীয় পার্টি এসেছে। আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন না পাওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দাঁড়াচ্ছেন, যাতে নির্বাচনে একটা প্রতিযোগিতার ভাব থাকে। নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য দেখাতে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে তারকাদের। ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান এবং চলচ্চিত্র অভিনেতা ফেরদৌস আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন। বিএনএম থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সঙ্গীতশিল্পী ডলি সায়ন্তনী। মনোনয়নের দৌড়ে ছিলেন অভিনেত্রী শমী কায়সারসহ আরও ডজনখানেক তারকা। আর মাশরাফিসহ পুরনো তারকারা তো আছেনই।

একটা ফ্যাসিবাদী সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল তৈরির সুনিপুণ চেষ্টা চলছে। নির্যাতন, নিপীড়ণ, ভোটাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র হরণকে ভুলিয়ে দিয়ে একতরফা নির্বাচনের পাতানো উৎসবে জনগণকে যুক্ত করার চেষ্টা চলছে। অথচ প্রায় সকল সক্রিয় বিরোধী রাজনৈতিক দলই নির্বাচন বর্জন করেছে, কোন সচেতন নাগরিক সজ্ঞানে এই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে এটা বলতে পারছেন না। এত বড় বিষয়কে ঢেকে রেখে, জনপ্রিয় তারকাদের হাসিমুখের প্রদর্শনীর আয়োজন করে, সাজ সাজ রব তৈরি করে– মানুষের সকল অধিকার হরণের উৎসব চলছে। সাকিব নির্বাচনে দাঁড়াবেন এই পরিকল্পনা আগেই ঠিক করা ছিল। বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের ও সাকিবের পারফরমেন্স মোটামুটি ভাল হবে এবং এই আবেগকেও ফ্যাসিবাদী সাংস্কৃতিক পুঁজি করা হবে– এর সমস্ত পরিকল্পনাই তৈরি **২য় পৃষ্ঠায়**

নির্বাচন বয়কট করুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশের অভাবনীয় খারাপ পারফরম্যান্স এই পরিকল্পনাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো।

উগ্র জাতীয়তাবাদী আবেগকে কাজে লাগানো ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য। ভারতে বিজেপিও তাই চেয়েছিল। নরেন্দ্র মোদির নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলায় নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে ভারত জিতবে এবং 'ভারত মহান' জিগির উঠবে গোটা দেশে– এটা ছিল বিজেপির পরিকল্পনা। ভারত হেরে যাওয়ার পর ড্রেসিং রুমে নরেন্দ্র মোদি খেলোয়ারদের উৎসাহিত করছেন, তাদের সান্তনা দিচ্ছেন– এমন একটা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এই ভিডিওকে কেন্দ্র করে যে উন্মাদনা তৈরি করা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায়, ভারত জিতলে পরিস্থিতি কেমন হতো।

সাজানো নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কর্মহীন বেকার যুবকদের হাতে টাকা দেয়া হচ্ছে, নির্বাচনের নামে খোলা হয়েছে 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ'। সুবিধা আর অর্থের জোয়ার, দেশের স্বাধীনতার মালিকানা আর উন্নয়নের প্রচার– এসবকিছু দিয়ে মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। এ এক ভয়াবহ রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব, সর্বস্ব খোয়ানো বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বীভৎস ফ্যাসিস্ট চেহারা।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ন্যাক্কারজনক

নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার কথা থাকলেও, বর্তমানে তাদের কর্মকা- এই পাতানো নির্বাচনকেই সহযোগিতা করছে। নির্বাচন বাতিলে ইসির ক্ষমতা কমিয়ে গত ৪ জুলাই জাতীয় সংসদে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) সংশোধনী পাস হয়। এতে ভোটগ্রহণের দিনের আগে ইসি চাইলেও নির্বাচন বন্ধ করতে পারবে না। এ ছাড়া রিটার্নিং কর্মকর্তা ফলাফল ঘোষণা করার পর কোনো অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও পুরো আসনের (সংসদীয়) ফলাফল স্থগিত বা ভোট বাতিল করতে পারবে না, শুধু যেসব ভোটকেন্দ্রে অনিয়মের অভিযোগ থাকবে, সেসব ভোটকেন্দ্রের ফলাফল চাইলে স্থগিত করতে পারবে। আর ক্ষমতা খর্ব করে এ সংক্রান্ত সংশোধনের প্রস্তাব খোদ নির্বাচন কমিশন থেকেই পাঠানো হয়েছিল। ইসি ঘোষণা দিয়েছে এক শতাংশ ভোটার ভোট দিলেও নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। তারা পূর্বে 'কোন অভিযোগ না আসলে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের রদবদল হবে না' বলেছে আওয়ামী লীগকে জেতানোর জন্য। আবার এখন সকল থানার ওসি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের বদলির আদেশ দেয়া হচ্ছে এটা দেখানোর জন্য যে, তারা নির্বাচন সুষ্ঠু করতে পদক্ষেপ নিচ্ছে। বাস্তবে আওয়ামী লীগের সকল সিদ্ধান্ত তারা সরকারের নির্দেশেই নিচ্ছে।

এই একতরফা নির্বাচনের পরিণতি কী

দেশের মানুষের আওয়ামী লীগের এই ফ্যাসিস্ট শাসনে ভীষণ ক্ষুব্ধ। কিন্তু তারা যে কোন প্রকারে আবার ক্ষমতায় আসতে চায়। ফলে এই দল আর জনগণের উপর নির্ভর করে দাঁড়াতে পারছে না। তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের উপর। এটা করতে গিয়ে ইতিমধ্যে তারা রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছে। আইনসভা নিজেই বেআইনি। সরকারের কথার সাথে সামান্য বিরোধের কারণে প্রধান বিচারপতিকেই দেশ ছাড়তে হয়েছে।

এই সময়ে বিচার বিভাগকে একতরফা নির্বাচনের কাজে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিএনপির কোন নেতার জামিন না হলেও শাহজাহান ওমর নির্বাচনে অংশগ্রহণে সম্মতি দেয়ায় তাকে জামিন দেয়া হয়েছে। তফসিল ঘোষণা চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট আবেদনের রায়ে হাইকোর্ট বলেছেন, নির্বাচন আল্লাহ্‌র হুকুমে হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, আমলাতন্ত্র– প্রত্যেকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর মতো নয়, বরং একজন দলীয় কর্মীর মতো ভূমিকা রাখছেন। এতে রাষ্ট্রের এই প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর মানুষের আস্থা তলানীতে গিয়ে পৌঁছেছে। কোনরকম ব্যবস্থাই এখন কাজ করছে না। যে কোনভাবে সমর্থন আদায় করাই এখন আওয়ামী লীগের প্রধান কাজ। প্রতিটি ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার চাইতে দলীয় আনুগত্যই প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে শুধু প্রশাসন নয়, সেবা খাতসহ প্রতিটি বিভাগ দুর্নীতিগ্রস্থ। রাষ্ট্রের ন্যূনতম কাঠামোটাই নড়বড়ে হয়ে পড়ছে। চলছে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। ডলারের রিজার্ভ ক্রমাগত কমছে। শুধু নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশকে স্থিতিশীল দেখানো হচ্ছে। এই চিত্র একতরফা নির্বাচন সংঘটিত হয়ে গেলে থাকবেনা। তাই তো প্রধানমন্ত্রী অগ্রিম ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, আগামী বছরের মার্চ মাসে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে চায় ষড়যন্ত্রকারীরা। পরিস্থিতি কতখানি নাজুক তার এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়।

ফ্যাসিবাদের প্রকৃত চরিত্র উন্মোচিত হওয়া জরুরি

একটা গণতন্ত্রবিহীন, ভোটাধিকারহীন, বাক স্বাধীনতাহীন ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা আছি। আওয়ামী লীগ এই ফ্যাসিবাদী শাসনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আওয়ামী লীগ তার প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করছে। এর কারণ আমাদের দেশটি একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শোষণমুক্তি হলেও, যুদ্ধের পর আমরা একটা পুঁজিবাদী অর্থনীতিভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি। এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ হলো বৈষম্য। এই ব্যবস্থায় একদিকে কতিপয় ব্যবসায়ী ফুলে ফেঁপে উঠে, অন্যদিকে দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষের আয় কমতে থাকে। বিগত ৫২ বছর ধরে দেশে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চলছে। এর ফলাফলে আমরা দেখি যে, প্রায় ১০০টি ব্যবসায়ী পরিবার বর্তমানে গোটা দেশের অর্থনীতির সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে। এই গোষ্ঠীর স্বার্থেই দেশের রাজনীতি পরিচালিত হয়। সকল রকম নীতি নির্ধারণ করা হয়। বেক্সিমকো গ্রুপ, সামিট গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, এস আলম গ্রুপ- ইত্যাদি গ্রুপের সরাসরি সম্পৃক্ততা জনগণ চোখের সামনে দেখছে। সকল পুঁজিবাদী দেশেরই এই চিত্র। রাজনৈতিক দলগুলো এই পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার মাত্র।

আজকের যুগে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পরিচালিত কোন দেশই জনগণের মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না। পুঁজিবাদের উন্মেষের যুগের আপেক্ষিক স্থায়িত্বও এখন তার নেই। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট এখন প্রতিদিনের সংকট, এবেলা-ওবেলার সংকট। এজন্য এখন উন্নত-অনুন্নত সকল দেশেই পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে নির্মমভাবে ব্যবহার করতে হয়। এই ফ্যাসিবাদী প্রবণতা এখন বিশ্বের সকল দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ই বিদ্যমান। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শুরু থেকেই এই প্রবণতা আমরা দেখতে পাই।

আজ যখন দেশটি স্বাধীনতার ৫২ বছর অতিক্রম করেছে, অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ যত সংহত হয়েছে, ফ্যাসিবাদ তত তীব্র হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আমরা দেশের রাজনীতিকে বিচার করলে দেখতে পাব যে, সংকটময় পুঁজিবাদের কালে জন্ম নেয়া একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক ঠাঁটবাটও তারা ধরে রাখতে পারছে না। সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাকে পদদলিত করেই এখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হচ্ছে। মত প্রকাশ, ভোট দেয়ার অধিকার– ইত্যাদির জন্য তাই মানুষকে কিছুদিন পরপরই রাস্তায় নামতে হচ্ছে। আন্দোলনের রেশ যতদিন থাকে ততদিন খানিকটা সংযত ও সতর্ক থাকে শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু কিছুদিন পর আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

গণআন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধিই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার শর্ত

আমাদের দল 'বাসদ (মার্কসবাদী)' এবং আমাদের জোট বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে নির্দলীয়, তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আমরা লড়াই করছি। আমরা একটি আপেক্ষিকভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন চাই। কিন্তু একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হলেই জনগণের সমস্যার সমাধান হবে না। একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে নির্বাচনে টাকার শক্তি, পেশিশক্তি ও মিডিয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা নিজেদের পছন্দের শাসককে জিতিয়ে আনে। তখন নির্বাচিত সরকারও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের স্বার্থেই কাজ করে। ফলে একটা নির্বাচন হলেই দেশের জনগণের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবেনা এটাই সত্য। আবার কালো টাকা, পেশিশক্তিমুক্ত নির্বাচনের জন্য জনগণের আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নটিও অত্যন্ত জরুরি। কারণ ভোটাধিকারসহ গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে অধিকারবোধ জাগ্রত হয়। গণআন্দোলনের মাধ্যমে শাসকের পরিবর্তন ঘটাতে পারলে জনগণের নিজেদের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস তৈরি হয়। আন্দোলনের উত্তাপ যত দিন থাকে তত দিন শাসকশ্রেণিরও একটা ন্যূনতম জবাবদিহিতা থাকে। শুধু ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন নয়, এই ব্যবস্থার পরিবর্তন যারা সত্যিকার অর্থে চান, এটা কিছুদিনের জন্য হলেও তাদেরকে একটা ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশ দেয়।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকল বুর্জোয়া দলই সাম্রাজ্যবাদের দ্বারস্থ হচ্ছে

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল মোমেন বলেছিলেন, ভারতকে বলেছি শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য। মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির নেতাদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা করেছেন। নির্বাচন কমিশনসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে গিয়েছেন ও তারপর সংবাদ সম্মেলন করেছেন। জামায়াতে ইসলামীর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক না হলেও, বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদে প্রকাশ, গত ২৬ অক্টোবর গুলশানের আমেরিকান ক্লাবে আমেরিকান দূতাবাসের পলিটিক্যাল সেক্রেটারি ম্যাথিউ ব্যের সাথে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা: সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের একটি গোপন বৈঠক হয়েছে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি পিটার হাসের কাছে বারবার যাচ্ছে। পিটার হাসের অভিভাবকদের সাথে আমাদের তলে তলে বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

এদিকে ভারত শেখ হাসিনাকে সমর্থন দিচ্ছে। ভারতের খোলামেলা সমর্থন বাংলাদেশে এই অগণতান্ত্রিক সরকার টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা রাখছে। ২০১৪ সালে আমরা দেখেছি যে, ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত জাতীয় পার্টির সাথে বৈঠক করে চাপ সৃষ্টি করেছেন নির্বাচনে আসার জন্য। ভারতের এই ভূমিকা দেশে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উস্কে দিচ্ছে। এর সুযোগ নিচ্ছে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো।

চীন এবং রাশিয়াও আওয়ামী লীগকে সমর্থন করছে। চীন বাংলাদেশে সংবিধানসম্মত নির্বাচনের কথা বলছে যা পরোক্ষভাবে তদারকি সরকারের বিপক্ষে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের পক্ষে যায়। রাশিয়া বাংলাদেশস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ভূমিকাকে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি হস্তক্ষেপ বলে বিবৃতি দিয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে, বিএনপির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে ভারত, চীন ও রাশিয়ার এই অবস্থানের নিন্দা করা হয়েছে। এদিকে বিএনপি আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশংসা করে কিছুদিন পরপরই নিজেদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে কার্ড প্রকাশ করছে। বাংলাদেশের এই বড় দুই দল, কেউ ক্ষমতায় যাওয়া আর কেউ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সাথে এমন বোঝাপড়া গড়ে তুলেছেন যে তাদের হয়ে প্রচার পর্যন্ত করতে তারা পিছপা হচ্ছেন না। এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য বিপদজনক ব্যাপার।

গণতন্ত্র রক্ষায় গণআন্দোলনের শক্তি বামজোটকে শক্তিশালী করুন

আওয়ামী লীগ যে একতরফা নির্বাচনের পাঁয়তারা করছে তা জনগণকেই রুখে দিতে হবে। আমরা আপনাদের কাছে আহবান জানাচ্ছি– এই নির্বাচন বয়কট করুন। গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার রক্ষায় গণআন্দোলন গড়ে তুলুন। গণআন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের প্রবল প্রতিরোধ ছাড়া গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। বুর্জোয়া বড় বড় দলগুলোর অবস্থা আমরা দেখছি। ক্ষমতা ব্যতীত অন্যকিছু তাদের কাছে প্রধান নয়। এজন্য তারা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে জিম্মি রাখতেও পিছপা হয়না। একটা আপেক্ষিকভাবে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের পছন্দের প্রতিনিধি বেছে নিক– সেই অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে আমরা লড়াই করছি ঠিক। কিন্তু এও ঠিক যে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই বড় দলগুলো ক্ষমতায় আসলেও মানুষের জীবনের কোন পরিবর্তন হবে না। শোষণ-বৈষম্য কমবে না, শোষণকারীর হাতবদল হবে মাত্র। গণআন্দোলনের শক্তিই গণতন্ত্রের একমাত্র গ্যারান্টি। যতক্ষণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ, লড়াকু ও অধিকার সচেতন– ততক্ষণই সে তার অধিকার জোর করে আদায় ও রক্ষা করতে পারে। এছাড়া দেশের কোন আইন, প্রশাসন, বিচার বিভাগ তাকে ন্যূনতম অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় না। কারণ সেই যুগ আর নেই। এখন এই প্রতিষ্ঠানগুলো বুর্জোয়া ব্যবস্থার সেবাদাসে পরিণত হয়েছে।

এ সময়ে একমাত্র বামপন্থী শক্তিই সেই গণআন্দোলনের চেতনা ধারণ করে। এদেশের বাম গণতান্ত্রিক শক্তি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বামপন্থী শক্তির নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমেই আজকের দিনে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও রক্ষা হতে পারে। তাই ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ে বামজোটের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমরা আহবান জানাচ্ছি।

সাম্যবাদ
১১ বর্ষ, ০৬ সংখ্যা, প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৩

শ্রমিকের মজুরির জীবন-মরণ লড়াইয়ের গল্পগাঁথা

দেশের অর্থনীতি টিকিয়ে রাখতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ ডলার লাগে। ডলার দিয়ে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য, যেমন– গম, তেল, চিনি ইত্যাদি আমদানি করা হয়, তেমনি শিল্প কারখানার কাঁচামাল, মেশিনপত্র ইত্যাদি কেনা হয়। এই প্রয়োজনীয় ডলার মূলতঃ গার্মেন্টস শ্রমিকদের তৈরি জামা-কাপড় বিদেশে বিক্রির মাধ্যমে আসে। গত অর্থ বছরে ৪২.৬ বিলিয়ন ডলার আসে এই শ্রমিকদের পরিশ্রমের ফলে। অথচ তারা যে মজুরি পায় তা দিয়ে তাদের সংসার চলে না। তারা ঘর ভাড়া দিলে দোকানের বাকি পরিশোধ করতে পারে না। তাই এবার তারা নুন্যতম মজুরি দাবি করেছিল পঁচিশ হাজার টাকা।

বাস্তবে তারা ন্যায্য মজুরি দাবি করেনি, মনুষ্যোচিত মজুরি দাবি করেনি, শোভন মজুরি দাবি করেনি, তারা দাবি করেছে ন্যূনতম জীবন ধারণ করার মতো মজুরি। চাষি যেমন পশুকে খড়, ঘাস, খাদ্য দেয় যাতে পরদিন সে হাল চাষ করতে পারে, তেমনি একজন শ্রমিক তার দেহে গড়পরতা ২৮০০ কিলোক্যালরি খাদ্য উত্তাপ তৈরি না করলে পরদিন মেশিনের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। পাঁচজনের পরিবারে, জনপ্রতি প্রয়োজনীয় ২৮০০ কিলোক্যালরি ধরলে পঁচিশ হাজার টাকা মজুরি একেবারেই ন্যূনতম।

প্রয়োজনীয় মজুরি না দিয়ে শ্রমিককে ঠকাচ্ছে মালিক ও রাষ্ট্র

১. মুদ্রার রূপে প্রকাশিত পণ্যের মূল্যকেই বলে তার দাম। পৃথিবীর সব পণ্যের দাম ঠিক করে পণ্যের বিক্রেতা। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিকও বাজারে যায় তার শ্রম বিক্রি করতে। কিন্তু শ্রমের দাম সে ঠিক করতে পারে না। এটা ঠিক করে পণ্যের ক্রেতা। বর্তমান বাজার ব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে পণ্যের দাম বাড়ে বা কমে। কিন্তু শ্রম নামক পণ্যটির বেলায় দেখা যায় দাম সবসময়েই কম থাকে, অর্থাৎ কারখানার মালিকরা বাজারমূল্যের অনেক কম দাম দিয়ে শ্রম কেনে। এর কারণ বিরাট সংখ্যক কর্মহীন লোকের উপস্থিতি। হাতের কাছে যথেষ্ট শ্রমিক থাকলেই মালিক কম মজুরিতে কাজ করাতে পারে না, সেজন্যই আধুনিক রাষ্ট্রে শ্রম আইন তৈরি হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র, আইন, প্রশাসন– সবই মালিকের হাতে বলে শ্রমিক এই দামে শ্রম দিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ আধুনিক যুগের শ্রমিকরা মজুরি শ্রমিক নয়, মজুরি দাস। ফলে শ্রমিকরা প্রয়োজনের চেয়ে কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়ে প্রথমবার ঠকছে।

২. আবশ্যিক শ্রম এবং উদ্বৃত্ত শ্রমকে যথাক্রমে মজুরি পরিশোধিত শ্রম এবং মজুরি অপরিশোধিত শ্রম হিসাবে ভাগ করার সকল চিহ্ন মুছে ফেলে, সকল শ্রমই মজুরি পরিশোধিত শ্রম হিসাবে মালিকগোষ্ঠী দেখাতে চায়। কিন্তু এই মজুরি অপরিশোধিত শ্রম থেকেই পুঁজি গঠন হয়। আমরা মার্কসের পুঁজি গ্রন্থ থেকে তা জানি। এতে শ্রমিকরা আবশ্যিক শ্রমের দাম পেলেও উদ্বৃত্ত শ্রমের দাম পায় না। তাতে শ্রমিকরা দ্বিতীয়বার ঠকে। এটাও তারা মানতে বাধ্য হচ্ছে। এ কারণে শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পায় না, সমাজ বদল ছাড়া তা পাবেও না ।

৩. শ্রমিকের শ্রমশক্তি অস্বাভাবিকভাবে নিংড়ে নেওয়ার মাধ্যমে শ্রমিককে মালিক তৃতীয়বার ঠকাচ্ছে। অর্থাৎ লাইন পদ্ধতি, কনভেয়ার বেল্ট, পিসরেট ইত্যাদি বিভিন্ন কায়দায় মালিক শ্রমিকদের চুক্তির অধিক শ্রমশক্তি ব্যবহার করছে। বেল্ট যত বেগে ঘুরবে, শ্রমিকের হাতও তত বেগে উঠতে হবে মাল উঠানো-নামানোর জন্য। লাইনে প্রতি এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে একটা পোষাক তৈরি হয়। একজন শ্রমিক বাথরুমে গেলে সম্পূর্ণ লাইন বন্ধ হবে তাই শ্রমিক পানি খেতে এবং বাথরুমে যেতে পারে না। ফলে তার কিডনির রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। পিসরেটের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক টার্গেট দিয়ে কাজ করানোতে জীবনীশক্তি নষ্ট করে বেশি কাজ করতে হচ্ছে শ্রমিককে। বলা হয় এক্ষেত্রে সে মজুরি বেশি পায়। দিনে যত মজুরি পায়, দিনরাত জুড়ে কাজ করলে সে রাতের মজুরিও পায়– সেটা তো আর বেশি পাওয়া নয়। নিজের শরীর ধ্বংস করে আয় করা। উপরন্ত সোয়েটারে কেউ ১০ বছরের বেশি কাজ করতে পারে না। এর মধ্যেই তার জীবনীশক্তি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সে কোন পেনশন বা রেশন বা ওয়েলফেয়ারের কোন সহযোগিতা মালিকপক্ষ বা রাষ্ট্র থেকে পায় না। মজুরি সামান্য বাড়লেও কাজের চাপ দুই তিনগুণ বেড়ে যায় বলে আজকাল শ্রমিকদের একাংশ মজুরি বৃদ্ধির দাবি তুলতেও ভয় পায়।

শ্রমিকের মজুরি প্রশ্নে আরও কিছু বিবেচ্য বিষয় ও বক্তব্য

১. বিশ্বায়নের যুগে আমেরিকার নিউইয়র্কের বাজারে যে শার্টটা পাওয়া যায় তা তো নানা দেশের শ্রমিকরাই বানিয়ে পাঠায়। বিদেশে শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি কত? বিশ্বের দেশে দেশে নিম্নতম মজুরির খোঁজ নিলে জানা যাবে বাংলাদেশে পোষাক শ্রমিকদের মজুরি সর্বনিম্ন। চীনে ৩০০, ইন্দোনেশিয়াতে ২৪৩, কম্বোডিয়াতে ২০০, ভারতে ১৭২, ভিয়েতনামে ১৭০ আর বাংলাদেশে শুধু ৭২ ডলার। এই মজুরি দিয়ে যদি ঐসব দেশের গার্মেন্টস শিল্প যদি আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকতে পারে, বাংলাদেশ কেন বাজার হারাবে?

বাংলাদেশের পোশাক গুণগত মানে বিশ্বে দ্বিতীয়। ওসব দেশে তো এত মজুরি দিয়েও মালিকরা টিকে আছে, আমাদের মালিকরা কেন টিকবে না?

২. শ্রমিক ও আমলা– এক বাজারেরই ক্রেতা। একজনের পকেটে লক্ষ টাকা বেতন, আর অন্যজনের হাজার টাকা মজুরি। মাছ-তরকারি দামাদামি ছাড়াই আমলারা কিনে নিতে পারছে আর শ্রমিক বাজারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে খালি হাতে বাড়ি চলে যাচ্ছে। এসব বিবেচনা করে কি প্রত্যাশিত মজুরি বৃদ্ধি করা উচিত নয়? মজুরি বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রমিকদের রেশন ও আবাসনের ব্যবস্থা করা দরকার। আমাদের দেশে প্রতিরক্ষাবাহিনী, পুলিশ, দুদকসহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারিরা রেশন পান, কিন্তু যাদের শ্রমের উপর দেশ দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে কোনরকম সহায়তা করা হয় না। এগুলো নিশ্চিত হলে মালিকরা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন না, বরং শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বাড়বে।

৩. মজুরি বোর্ডে মালিক পক্ষ, শ্রমিক পক্ষ ও রাষ্ট্রপক্ষ ত্রিপক্ষীয় দর-কষাকষির মাধ্যমে মজুরি ঠিক করতে পারতো। কিন্তু রাষ্ট্র স্থায়ী মজুরি বোর্ড গঠন না করে ছয়মাস মেয়াদী মজুরি বোর্ড গঠন করে। এই মেয়াদের সাড়ে পাঁচ মাসই চলে গেলো পরস্পর পরিচিত হতে আর মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে শাসক দলের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে। শেষের পনের দিনে কোন যুক্তিতর্ক বা দর কষাকষি ছাড়াই তড়িঘড়ি করে মালিক পক্ষের দেয়া প্রস্তাবনা সমর্থন করে গেজেট তৈরি করে ফেলা হলো। এতে শ্রমিকরা নিদারুণভাবে ঠকলো ও বিক্ষুব্ধ হলো।

৪. শ্রমিকদের দাবি ছিল নিচের দিক থেকে গ্রেড কমিয়ে সাতটার স্থলে পাঁচটা গ্রেড করা হোক। বোর্ড বিপরীতক্রমে উপরের দিক থেকে গ্রেড কমিয়ে চারটা গ্রেড করলো! ২৫ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি আমরা হেলপার গ্রেডে চাইছিলাম, অথচ গেজেটে হেলপার গ্রেডে প্রস্তাব দেয়া হলো ১২,৫০০ টাকা। শুধুমাত্র হেলপারই নয়, সকল গ্রেডেই আমরা মজুরি বৃদ্ধি চাইছিলাম। কিন্তু মালিকপক্ষ চালাকি করে উপরের দিক থেকে গ্রেড কমিয়ে শ্রমিকদের মজুরি সংকোচন করে বাস্তবে তার দক্ষতাকে গলা টিপে হত্যা করলো। এতে উপরের দিকের অভিজ্ঞ দক্ষ শ্রমিকরা শ্রম দেবার উৎসাহ হারাবে। উৎপাদনের মান কমবে। মসলিন যেমন বিলুপ্ত হয়েছিল, ক্ষমতার জোরে মালিকরা গার্মেন্টসকে সে পরিস্থিতির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। মোট মজুরির ৬৫% আমরা বেসিক মজুরি চাইছিলাম। অথচ প্রস্তাবিত গেজেটে ৫৩.৬% বেসিক দিয়ে গেজেট করা হলো।

৫. আমরা প্রতি বছর ১০% ইনক্রিমেন্ট চেয়েছিলাম। অথচ গেজেটের ৫% ইনক্রিমেন্ট বহাল রাখা হলো। এদেশে নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যের দাম সকালে-বিকালে বাড়ে। মুদ্রাস্ফীতি যেখানে বছরে ৯%, সেখানে ৫% ইনক্রিমেন্ট কি করে মানা সম্ভব? বাড়ি ভাড়া ৩৩৫০ টাকা, যাতায়াত ভাতা ৪৫০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৭৫০ টাকা, খাদ্য ভাতা ১২৫০ টাকা– সবই প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

তাই শ্রমিকরা এই ঘোষণা মানেনি। না মানার এবং আপত্তি জানাবার গণতান্ত্রিক অধিকার শ্রমিকদের আছে। কিন্তু কেন শ্রমিক মানলো না তার জন্য কমিউনিটি পুলিশ, শিল্প পুলিশ, থানার পুলিশ থাকার পরও ২৩২ প্লাটুন বিজিবি নামানো হলো। যাদের দায়িত্ব ছিল সীমান্ত রক্ষার করার তারা শ্রমিকদের সাথে যুদ্ধে নামলো। গোয়েন্দা সংস্থা তৎপর হলো। কেন শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো? চারজন শ্রমিক মারা গেল।

সরকার মজুরি অধিকার ও আইন একেবারেই মানে না

১. ন্যূনতম মজুরি আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে আইন দ্বারা স্বীকৃত। 'আইএলও'-এর ১৩১ ধারায় বলা হয়েছে– "শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রয়োজন, জীবন যাত্রার ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।" আমাদের কথিত শ্রমিকবান্ধব রাষ্ট্র এই আইন অনুস্বাক্ষরই করেনি! বাংলাদেশ 'আইএলও'-এর তিনটি সনদের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি। এই তিনটি সনদ হলো 'সনদ ৮৭ (সংগঠন করার অধিকার সনদ)', 'সনদ ৮৮ (সংগঠিত হওয়া এবং যৌথ দর-কষাকষির অধিকার)' এবং 'সনদ ৮১ (শ্রম পরিদর্শন)'।

২. 'জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা (১৯৪৮)'-এর ২৩ নং অনুচ্ছেদে আছে– "প্রত্যেক কর্মীর নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষায় সক্ষম এমন ন্যায্য পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার রয়েছে।" এই আইনটা অনুস্বাক্ষর করলেও মানে না সরকার।

৩. বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(খ) অনুচ্ছেদে আছে,"কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব।" অথচ রাষ্ট্র এসব না করে আইন লঙ্ঘন করছে। সরকার দমে দমে গদি রক্ষায় সংবিধানের কথা বললেও শ্রমিকের অধিকারের বেলায় আর সংবিধান মানছেন না।

মালিকরা কি সত্যি মজুরি বাড়াতে অপারগ

পোষাক ডলারে বিক্রি হয়। ২০১৮ সালে এক ডলারে পাওয়া যেত ৮৩.৯০ টাকা। ২০২৩ সালে সরকারি হিসাবেই পাওয়া যায় ১১০.৫০ টাকা। অর্থাৎ ডলারের মূল্য ৩১.৭৭ শতাংশ বেড়েছে। সুতরাং শুধু ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণেই ২০১৮ সালের ৮ হাজার টাকা মজুরি ২০২৩ সালে ১০,৫৩৬ টাকাতে দাঁড়ায়। তৈরি পোষাকের মোট উৎপাদন খরচে মজুরি বাবদ খরচ হয় ১ থেকে ৩ শতাংশ। তাই ডলারে মূল্যবৃদ্ধিতে মালিকদের আয়াসহীন বাড়তি লাভ (উইন্ডফল গেইন) হচ্ছে শ্রমিকের প্রাপ্য অংশের ৫০ গুণ। এই বাড়তি লাভ দিয়েই মালিকরা অনায়াসেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিকের যে হিস্যা প্রাপ্য– তা দিতে পারেন। বলা বাহুল্য, টাকার দরপতন এখনো শেষ হয়নি। ফলে ভবিষ্যতে আগামী ২০২৮ সাল অবধি টাকার দরপতনে যে লাভ হবে, তার হিস্যা মালিকেরই থাকবে, শ্রমিকরা পাবে না। কেন না মজুরি একবার স্থির হলে গেলে পরের মাসে কিংবা বছরে তা আর বাড়ানো হয় না। তাই এই কাঙ্ক্ষিত মজুরি মালিক তার পণ্য বিক্রি মুনাফায় হাত না দিয়েও ডলারের লাভ থেকেই দিতে পারেন।

মালিকরা নানা সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন শ্রমিকের দরিদ্রতা দেখিয়েই, অথচ শ্রমিককে তারা বাঁচার মত মজুরি দিচ্ছেন না! সকলেই জানে গরীব দেশের শ্রমিকের দারিদ্র্য দেখিয়ে এবং তা বিক্রি করেই আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কোটা সুবিধা এবং জিএসপি সুবিধা পেয়েছিলাম। তা দিয়ে আমাদের মালিকরা রাতারাতি কোটি কোটি টাকার মালিক হলেও কোন হিস্যাই তারা শ্রমিকদের দেয়নি। এছাড়া তারা আরও অনেকরকম সুযোগ-সুবিধা পান।

১. যেখানে অন্য কারখানার আয়কর ২০ থেকে ৪৫ শতাংশ সেখানে তৈরি পোষাক খাতে আয়করের হার ১৫ শতাংশ, সবুজ কারখানার জন্য ১০ শতাংশ। আবার রপ্তানীর সময় পোষাক মালিকরা ১ শতাংশ হারে যে উৎসে কর দিয়ে থাকেন তাও আয়কর থেকে বিয়োগ করা হয়। ফলে তারা প্রায়শঃ কোন আয়কর দেন না।

২. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসাব মতে বন্ডেড ওয়ার হাউজ ব্যবস্থার কারণে ২০১৯-২০ সালে মোট ১ লাখ ৫১ হাজার ৭৬৮ কোটি টাকার আমদানি শুল্ক রেয়াত দেয়া হয়েছিল যার ৮০% পেয়েছিল তৈরি পোষাক শিল্প। ফলে তৈরি পোষাক খাত যে বন্ডেড ওয়ার হাউজ সুবিধা ভোগ করেন সেখানে তারা কোন আমদানি শুল্ক দেন না।

৩. তৈরি পোষাকশিল্পের মালিকরা এখনও ১৫ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা পান। ফলে তারা নিজের বোঝা নিজে বহন না করে অনেকাংশে তা দেশের বাকি অর্থনীতি ও সমাজের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন যা দুর্ভাগ্যজনক।

অর্থনৈতিক অপারগতা নয় রাজনৈতিক কারণেই শ্রমিকরা মজুরিতে ঠকছে। রাষ্ট্রশাসনে গার্মেন্টস মালিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ আছে। সেই রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই মালিকরা শ্রমিকদের ঠকাচ্ছে। একাদশ জাতীয় সংসদের ৭০ শতাংশ সদস্যই ব্যবসায়ী শিল্পপতি। তারা রাষ্ট্র তাদের দখলে রেখে শ্রমিকদের মজুরি বঞ্চিত করছে। আজ তাই শ্রমিকদের রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে রাজনৈতিকভাবেই গড়ে তুলতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই। আবার মালিকরাও জানে না, শ্রমিকদের মজুরি যথাসম্ভব কম দেয়ার মধ্যে বিশ্ববাজারে তাদের অব্যাহত সাফল্যের চাবিকাঠি নিহিত নয়। বরং উৎপাদনশীলতার অব্যাহত বৃদ্ধির মধ্যেই তাদের সাফল্যের চাবিকাঠি, যেখানে শ্রমিকের অংশিদারিত্ব অনিবার্য। তাই শ্রমিকদের যৌক্তিক মজুরি দেবার বিকল্প নেই।

সাম্যবাদ

'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর মুখপত্র

শেষ পৃষ্ঠা

১১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৩

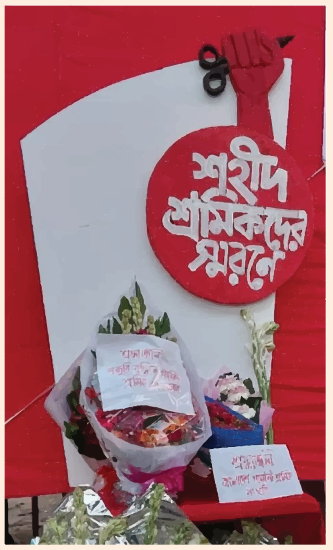

গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩, বিকাল ৪টায়, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'বাসদ (মার্কসবাদী)'–এর উদ্যোগে গার্মেন্টস শ্রমিক হত্যার বিচার, ২৫০০০ টাকা নিম্নতম মজুরি ঘোষণা, নিহত ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা, একতরফা নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পাঁয়তারা বন্ধ করে ফ্যাসিবাদী সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। নিহত শ্রমিকদের স্মরণে অস্থায়ী বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পার্টির নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-যুব-নারীসংগঠনসমূহ।

'জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১' বাতিলের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট দেশব্যাপী ৫ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। গত ৫ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আনু মুহাম্মদ। বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. তানজীমউদ্দীন খান, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম, শিশু ও শিক্ষা রক্ষা আন্দোলনের (শিশির) আহ্বায়ক রাখাল রাহা, অভিভাবক মো. আলী হোসেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সালমান সিদ্দিকী এবং সাধারণ সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদ।

(ছবিতে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, রাখাল রাহা এবং একজন অভিভাবককে স্বাক্ষর করতে দেখা যাচ্ছে।)

একতরফা তফসিল বাতিলের দাবিতে ১৫ নভেম্বর বাম জোটের ডাকে অর্ধবেলা হরতাল পালিত

একতরফা তফসিল প্রত্যাখ্যান করে এবং বাম জোটের হরতালের প্রচারে ফেনী জেলা বাম জোট মিছিল বের করলে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। হামলায় বাসদ (মার্কসবাদী) ফেনী জেলার আহ্বায়ক জসীম উদ্দীন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বায়ক নয়ন পাশাসহ আরো ৭-৮ জন গুরুতর আহত হন।

একতরফা তফসিল বাতিল ও ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকারের পদত্যাগ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও শিক্ষা উপকরণের দাম কমানোসহ ৬ দফা দাবিতে গত ২৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলন চত্বরে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের কেন্দ্রীয় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত। বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি সালমান সিদ্দিকী।

একতরফা নির্বাচন বয়কট, অবিলম্বে ঘোষিত তফসিল বাতিল, সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বাসদ (মার্কসবাদী) দলের উদ্যোগে সারাদেশে প্রচারপত্র বিলি ও সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে দলের নেতাকর্মীরা এই কর্মসূচী পালন করছেন।

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'-এর পক্ষে মো: শফি উদ্দিন কবির কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩। website: www.spbm.org, E-mail: mail@spbm.org